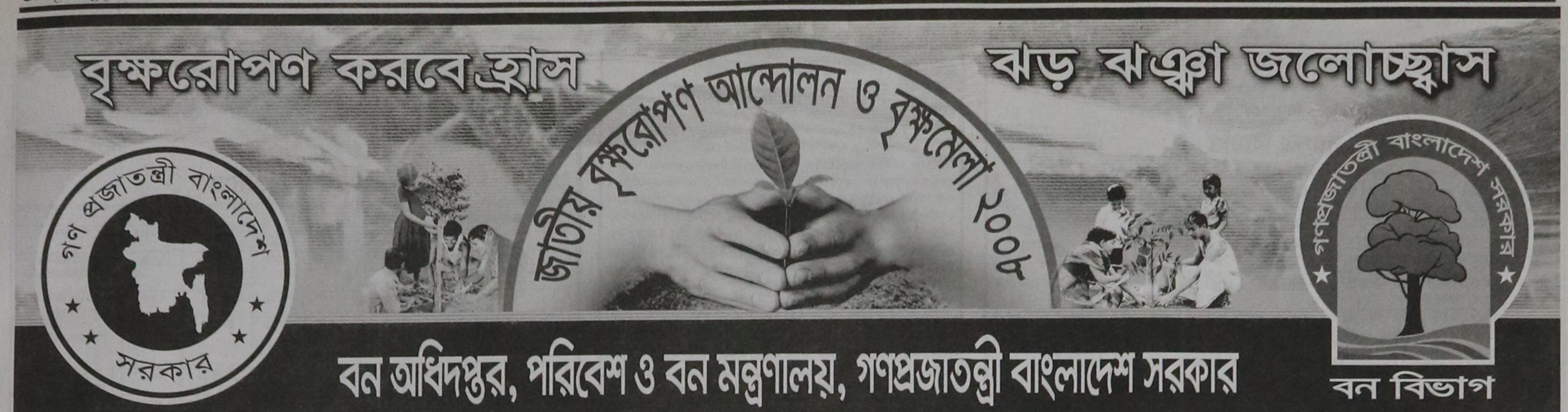

প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে সবুজ প্রাচীরের ভূমিকা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫
২৪ মে ২০০৮

বাণী

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় দেশের বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় ২৪ মে ২০০৮ থেকে মাসব্যাপী সারাদেশে 'বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলার' আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা বজায় রাখতে বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দ্রুত নগরায়ন দেশের বনজ সম্পদের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা ও নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার নেতিবাচক প্রভাব অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারি। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য ''বৃক্ষরোপণ করবে হ্রাস, ঝড় ঝঞ্ঝা জলোচ্ছাস'' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি, বসতবাড়ীর আঙ্গিনা, প্রান্তিক ও পতিত ভূমিতে ব্যাপক বনায়নের যে কর্মসূচি সরকার গ্রহণ করেছে আমি তাকে স্বাগত জানাই। আমি বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা' ২০০৮ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

বাণী

বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু। বৃক্ষহীন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার অন্যতম সহায়ক উপাদান ও শক্তি হচ্ছে বৃক্ষ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, লেখা-পড়ার সামগ্রী, রোগ নিরাময়ের ঔষধ, ইকো-ট্যুরিজম সবকিছুতেই রয়েছে বৃক্ষের অপরিসীম অবদান। এজন্য আমাদের ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে আরো বেশী মনোনিবেশ করতে হবে।

বর্ধিত জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল উজাড় হয়েছে, হ্রাস পেয়েছে বৃক্ষের মজুদ। পরিবেশের উপর পড়েছে এর বিরূপ প্রভাব। প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশ প্রতিবছর বন্যা জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। গত নভেম্বর, ২০০৭ এর সুপার সাইক্লোন ''সিডর'' দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। বসতবাড়ী, প্রতিষ্ঠান, পতিত ভূমি, চরভূমি, রাস্তাঘাট, শহর, বন্দর, সরকারী বন, প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ব্যাপক বনায়নই কমিয়ে আনতে পারে প্রাকৃতিক এ বিপর্যয়।

এবারের বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য ''বৃক্ষরোপণ করবে হ্রাস, ঝড় ঝঞ্ঝা জলোচ্ছ্বাস'' নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ শুধুমাত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেনা, বরং ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জানমাল রক্ষা, দারিদ্র নিরসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তাই সরকার নিবিড় বনায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছর ''বাংলাদেশ সবুজায়ন'' কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩ মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ আন্দোলন-২০০৮ ২৪ মে থেকে সারাদেশব্যাপী শুরু হচ্ছে। আমি আশা করি সকলের সহযোগিতায় ব্যাপক বৃক্ষায়নের মাধ্যমে একটি সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভবপর। তাই সমগ্র বাংলাদেশকে সবুজ শ্যামলীমায় ভরে দিতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে সর্বোপরি বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে সফল করতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষের পাশাপাশি অপ্রচলিত, বিলুপ্ত প্রায়, বিরল ও সংকটাপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদও রোপণ করতে আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা দরকার। তাই বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে চারার সহজলভ্য এবং বৃক্ষরোপণের আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য সরকার সারাদেশে বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে। এ মেলা হতে উন্নত প্রজাতির চারা সংগ্রহ করে ব্যাপক বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসার জন্য আমি সবার প্রতি আবেদন জানাই।

বৃক্ষরোপণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য যারা বৃক্ষরোপণে প্রধান উপদেষ্টার জাতীয় পুরস্কার-২০০৭ বিজয়ী হয়েছে এবং অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়ন সৃজনে যারা অংশীদারিত্বমূলক চেক পাচ্ছে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০০৮ সফল ও সার্থক হোক কামনা করি।

এ, এইচ, এম রেজাউল কবির একিউসি

বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মত মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে দেশের অর্থনীতি বারংবার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে ইদানিংকালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই এখন হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় আমাদের আরও বেশি প্রস্তুতি নিতে হবে।

পৃথিবীর পরিবেশ মানবসৃষ্ট একাধিক কারণে প্রতিনিয়ত তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মৌলিক উপাদান সমূহ যেমন মাটি, পানি ও বাতাস ক্রমাগত ভারসাম্য হারাচ্ছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ব্যাপকভাবে চাপ সৃষ্টি করছে প্রকৃতির মূল্যবান উপাদান সমূহের উপর। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এর সম্পদ ভান্ডার, অন্যদিকে প্রকৃতি হয়ে উঠছে বিক্ষুব্ধ; যেমন ঝড়, ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, মরুময়তা, ভূমিক্ষয় ও বায়ুদুষণের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়সমূহ প্রকটতর হয়ে উঠছে। প্রকৃতির এ বিপর্যয় এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃক্ষ সম্পদ থাকা, অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষ নিধন এবং সর্বোপরি ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন অন্যতম। একসময়কার জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আজ দারিদ্র ও সম্পদের স্বল্পতায় ভারাক্রান্ত। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনপদ প্রতিবছর বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে আর উত্তরাঞ্চল মরুময়তার প্রভাবে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু ক্রমশঃ প্রকটতর হচ্ছে। তাই, সর্বত্র আজ 'দাও ফিরে সে অরণ্য' প্রতিধ্বণিত এবং দেশব্যাপী প্রকৃতিকে অধিকতর সবুজায়নের প্রচেষ্টা গতিশীল হচ্ছে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়, বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো, বাংলাদেশও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকৌশল ও কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের দুরুহব্রত পালনে অগ্রপথিক। দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বন সেক্টরের মহাপরিকল্পনা, ১৯৯৩ ও জাতীয় বন নীতি,১৯৯৪ এর আলোকে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয় ও মরুময়তা রোধ, মহিলাদের কর্মসংস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। উপকূলীয় জেলাসমূহ এবং সমুদ্রের তীরবর্তী দ্বীপসমূহের চারদিকে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন বন অধিদপ্তরের এক যুগান্তকারী সাফল্য যা উপকূলীয় এলাকার অধিবাসীর জানমাল রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে যা নিম্নরূপ

১. ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। ২. গবাদিপশু মারা যায়। ৩. বাড়ীঘর ও সম্পদ নষ্ট হয়। ৪. কৃষি ফসল নষ্ট হয়।৫. জলোচ্ছ্বাসে লোনাপানি ঢুকে কৃষি জমির উর্বরতা বিনষ্ট হয়। ৬. মাছ ও চিংড়ি খামার বিনষ্ট হয়। ৭. লবণ চাষ ব্যাহত হয়। ৮. অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; যথা-ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়। ৯. স্কুল, কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১০. খাদ্যাভাব দেখা দেয়। ১১. গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ঃ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী। বঙ্গোপসাগরের উত্তরে অবস্থিত ১৯টি জেলা ও ১৪৮টি উপজেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার কৈখালী হতে শুরু করে পূর্বে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পর্যন্ত সমুদ্রতটরেখা ৭১০ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ৩,৪৭,৮৬,৫৮০ এবং আয়তন ৪৬,৮৭৩ বর্গ কি.মি.। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় উপকূলীয় অঞ্চল।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঃ ১৯৭০ সালে দেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫ লক্ষ লোক সাইক্লোনে মারা যায়। প্রলয়ংকরী ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় জনপদের প্রায় ১.৪১ লক্ষ লোকের প্রাণ কেড়ে নেয়। নোয়াখালী ও লক্ষীপুর এলাকায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার চেয়ে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়েছে। এর কারণ হল ১৯৬০ সাল থেকে বন অধিদপ্তরের গড়ে তোলা ম্যানগ্রোভ বাগান যা নোয়াখালী ও লক্ষীপুর এলাকায় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এলাকার চেয়ে পুরু সবুজ প্রাচীর তৈরী করেছে। সবুজ বৃক্ষের সারি তথা প্রশস্ত বন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রবল গতিবেগ প্রশমিত করে পেছনের জনবসতির জানমাল রক্ষা করে।

বিগত ১৫ নভেম্বর ২০০৭ ইং তারিখে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে আঘাত হানে যার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ২৪০ কিঃমিঃ। এতে সুন্দরবনের পশুপাখী, গাছপালা, ঘরবাড়ী, অফিস, অবকাঠামো, জলযান, Wireless Network ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চল এবং সামাজিক বন অঞ্চলের আওতাধীন ফরিদপুর ও কুমিল্লা বন বিভাগের অবকাঠামো ও বনজ সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। টাকার অংকে যার পরিমাণ ১০৪২.০০ কোটি। দেশের সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইক্লোন 'সিডরে' ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন বিভাগে জরীপ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে যার পরিমাণ ১৫০৯৮.২৬ কোটি টাকা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে সবুজ প্রাচীর ঃ সিডরের আঘাতে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় বিস্তীর্ন এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও সুন্দরবনের উত্তরে অবস্থিত জনপদ তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রশস্থ উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনসম্পন্ন এলাকা বনবিহীন উপকূলীয় এলাকা অপেক্ষা জনগণের জীবন-সম্পদ রক্ষায় প্রভূত ভূমিকা পালন করে।

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষার জন্য দু'ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, যথা- (১) সবুজ প্রাচীর সৃষ্টি এবং (২) পাকা দেয়াল বা বাঁধ তৈরির মাধ্যমে। জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমগ্র উপকূলব্যাপী বাঁধ বা পাকা দেয়াল নির্মাণ করা যেতে পারে। মাটির বাঁধ তৈরি করা হলেও এগুলো জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙ্গে জনপদে পানি ঢুকে যায়। খরচ বেশী বিধায় আরসিসি দেয়াল করার সামর্থ আমাদের নেই। তাই বৃক্ষের সবুজ প্রাচীর তৈরি করে জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে জানমাল রক্ষা করা সহজ ও খরচ কম। বৃক্ষরাজির সবুজ প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের শক্তি হ্রাস পায় এবং জনপদে আঘাত হানার আগেই দুর্বল হয়ে যায়। ফলে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়। নিম্নলিখিত স্থানে সবুজ প্রাচীর তৈরি করা যেতে পারে ঃ

এ কে এম শামসুদ্দীন
প্রধান বন সংরক্ষক

১. সমগ্র উপকূলব্যাপী ২-৩ কি.মি. প্রশস্ত সবুজ বেষ্টনী। ২. নতুন জেগে উঠা চরভূমিতে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ প্রাচীর সৃষ্টি। ৩. উপকূলীয় বাঁধের উভয়পাশে বৃক্ষরোপণ। ৪. বসতবাড়ি বনায়ন। ৫. প্রতিষ্ঠান বনায়ন। ৬. সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তায় বনায়ন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে বন বিভাগের কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল ঃ বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট ভূমির ১৭.০৮%। তম্মধ্যে সরকারী বন ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (১০.৩০%), অশ্রেণীভূক্ত বন ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর (৪.৯৫%) এবং গ্রামীণ বন ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর (১.৮৩%) রয়েছে । সরকারী বন ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণীভূক্ত বনাঞ্চল জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ (বিশ) ভাগ বনায়নের আওতায় আনার জন্য বন অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, ভূমির ক্ষয় রোধ, দেশের মরুময়তা রোধ, মহিলাদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমূহের মধ্যে অন্যতম হল বনায়ন। সরকারী বনাঞ্চলে বনায়নের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকা, উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চর ভূমি এবং সকল ধরনের প্রান্তিক ভূমি বনায়নের আওতায় আনা হচ্ছে।

উপকূলীয় বনায়নঃ ম্যানগ্রোভ বনায়নের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় জেলাসমূহের জনগণের জানমাল রক্ষায় বন অধিদপ্তর ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় ১০টি জেলার জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা তথা বনায়নের মাধ্যমে নুতন জেগে উঠা চর কৃষি ও বসতি স্থাপনের উপযোগী করে তোলার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বন অধিদপ্তর ১৯৬০ সাল থেকে উপকূলীয় বাঁধে এবং ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে নুতন জেগে উঠা চরে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১.৫৯ লক্ষ হেক্টর ভূমি উপকূলীয় বনায়নের আওতায় আনা হয়েছে। উপকূলীয় এ ম্যানগ্রোভ বন সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বনজ সম্পদ সৃষ্টি করেছে। এসব বনাঞ্চল একদিকে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ও প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন এলাকা হিসেবে কাজ করছে অন্যদিকে উপকূলীয় ভূমির সিকস্তি পয়স্তির গতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখছে।

১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকার উপকূলীয় এলাকায় বৃক্ষের একটি সবুজ প্রাচীর গড়ার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাত থেকে রক্ষা, দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধি, পরিবেশের উন্নয়নসহ গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৫-১৯৯৬ থেকে ২০০১-২০০২ মেয়াদে সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প গ্রহণ করে। উপকূলীয় ১২টি জেলার বন বিভাগের জমি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ, সওজ, রেলপথ ও সংযোগ সড়কের পার্শ্বে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১০৯৯৬ কিঃমিঃ বাগান এবং ৭০০ হেক্টর ফোরসোর বাগান সৃজনের মাধ্যমে সবুজ প্রাচীর তৈরী করেছে। বর্তমানে উপকূলীয় অঞ্চলে "চর বনায়ন প্রকল্প" এবং "সিডিএসপি- III" শীর্ষক দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মরুময়তা রোধে বনায়ন কার্যক্রমঃ দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা রোধে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক বনের অনুপস্থিতি এবং তদুপরি ব্যাপক বৃক্ষ নিধন দেশের উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ জনপদ মরুময়তায় আক্রান্ত হচ্ছে। ফলতঃ ভূমির মানের অবনতি ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস প্রকটতর হয়ে উঠছে। বলা হয়ে থাকে মরুময়তা রোধে বনায়নের বিকল্প কিছু নেই। বরেন্দ্র অঞ্চলে সরকারী বন নেই বললেই চলে তথাপি বসতবাড়ীর সংলগ্ন বৃক্ষাচ্ছাদন ১৯৭৫ সালে যেখানে ছিল ২.৭৫ শতাংশ ১৯৮৩ সালের এক হিসাবে তা এসে দাঁড়ায় মাত্র ১.৭১ শতাংশে। এ অবস্থায় দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ মহল ও বনবিদগণের সহায়তায় অত্র এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ এবং সম্পৃক্ত করে বন অধিদপ্তর ১৯৮১-৮২ সাল থেকে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ অঞ্চলে বন অধিদপ্তর ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বন অধিদপ্তর দেশের উত্তরাঞ্চলে "অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

তাছাড়া দেশব্যাপী বসতবাড়ী বনায়ন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন ও গ্রাম বনীকরণের মাধ্যমে সবুজ প্রাচীর তৈরী করা হচ্ছে।

বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ২০০৮ এ 'বাংলাদেশ সবুজায়ন' কার্যক্রম এর কর্ম পরিকল্পনাঃ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনের গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বনজ সম্পদের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপকহারে। সরকারী বনভূমি সহ, জনগণের বসতবাড়ী, প্রান্তিক ভূমি যথা রাস্তার ধারে, রেল লাইন ও বাঁধের ধারে, পতিত খাস জমিতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বনায়ন/বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বহুলাংশে মিটানো সম্ভব। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সকলের সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা ছাড়া বৃক্ষ সম্পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বনায়ন তথা বৃক্ষ রোপণে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে এবং এ প্রচেষ্টার সুফল বর্তমানে দৃশ্যমান। বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে আরোও বেগবান ও চলমান রাখার জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষ রোপণ আন্দোলন ও মেলার আয়োজন করা হয়। চলতি বৎসরে আরও ব্যাপক এবং অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে মাসব্যাপী বৃক্ষমেলা ছাড়াও বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও আর্থিক সংস্থানের ভিত্তিতে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ফলজ, বনজ, ঔষধি, শোভাবর্ধনকারী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির চারাকে সহজলভ্য, গুণাগুণ, রোপণ ও পরিচর্যা কলা-কৌশল সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেওয়াই বৃক্ষ মেলার মূল উদ্দেশ্য।

১. চলতি বৎসরে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা ঃ এ বছরে চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি। এর মধ্যে বন বিভাগ ৩ কোটি, ব্যক্তি পর্যায়ে ৬ কোটি এবং অন্যান্য সংস্থা ১ কোটি চারা রোপণ করবে।

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বন অধিদপ্তর, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইপিজেড, বিসিক, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়।

৩. বিভিন্ন প্রজাতির মওজুদ চারার সংখ্যা ঃ বিভিন্ন নার্সারীতে প্রায় ১৮ কোটি চারা মজুদ আছে। এর মধ্যে বন অধিদপ্তর ৪ কোটি, এনজিও নার্সারীতে ৩ কোটি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারীতে ১১ কোটি চারা রয়েছে।

৪. কোথায় চারা রোপণ করা হবে ঃ
ক. বন অধিদপ্তর ঃ সারাদেশে সরকারী বনভূমি, উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা নতুন চরভূমি, অন্যান্য চরভূমি, প্রান্তিক ভূমি যথা রাস্তার ধার, রেল লাইনের ধার, বাঁধের ধার, পতিত খাসভূমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
খ. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থাঃ স্বীয় প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও প্রান্তিক ভূমি ইত্যাদি।
গ. বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রান্তিক ভূমি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি ইত্যাদি।
ঘ. ব্যক্তি পর্যায়ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি, বসতবাড়ীর আংগিনা ইত্যাদি।
ঙ. শিল্প প্রতিষ্ঠানঃ শিল্প এলাকার পতিত/প্রান্তিক ভূমি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে চলমান বনায়ন কার্যক্রম ঃ বন অধিদপ্তরের অন্যতম কার্যক্রম হল বন সংরক্ষণ ও বনায়ন। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর ৬২৮৬.০০ লক্ষ টাকার উন্নয়ন এবং ১৬৩৮.৭৬ লক্ষ টাকা অনুন্নয়ন বরাদ্দের বিপরীতে ১৬ টি প্রকল্প ও ৭ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের আওতায় ৮২৩৮.০০ হেক্টর বনায়ন ও ১৮৩৩.৭০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বনায়ন এবং ১৮.৪৬ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হচ্ছে। কর্মসূচীসমূহের আওতায় ১৮২৩.০০ হেক্টর বনায়ন ও ০.২০ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হচ্ছে। এছাড়া যৌথবাহিনীর সহায়তায় জবরদখল থেকে উদ্ধার করা বন ভূমিতে ৪৫৫৭.০০ হেক্টর বনায়ন করা হচ্ছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩৬০.৯০ লক্ষ ও ৮১৩.১৮ লক্ষ টাকা। এ অর্থে ১৬ টি প্রকল্প ও ৬ টি অনুমোদিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত ১০টি কর্মসূচী এ বছর যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি প্রকল্পসমূহের আওতায় ৬৭৩৩.৫০ হেক্টর বাগান ও ১৬৫.১০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বনায়ন এবং ৯.২৮৫ লক্ষ চারা উত্তোলন এবং ৬ টি কর্মসূচির আওতায় ২০০০.০০ হেক্টর বনায়ন ও ০.২০ লক্ষ সংখ্যা চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১০০০.০০ হেক্টর এবং ৫০.০০ কি. মি স্ট্রীপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে সবুজ প্রাচীর সৃজনের পরিকল্পনাঃ সিডরের ক্ষয়ক্ষতি পূনর্বাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপক বনায়ন সৃজনের জন্য নীতিগতভাবে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদী (জুলাই,২০০৮ হতে জুন,২০১৩) Rehabilitation of Sidr Damage and Climate Change Resilient Afforestation" শীর্ষক ৬৫০.৮৬৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত ১টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলসহ সমগ্র দেশব্যাপী সবুজ প্রাচীর সৃষ্টির লক্ষ্যে